Vol. 4 | No. 2 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর-মানস

Volume	4
Issue	2
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	December 16, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i2.2
Pages	51-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মীর-মানস

মুনীর চৌধুরী

১.০. বর্তমান প্রবন্ধ মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পরিকল্পিত আমার বিস্তৃততর আলোচনার ভূমিকা হিসেবে পাঠ্য।

১.১. কোনো কবি-সাহিত্যিকের মানসপ্রকৃতি ও শিল্পকর্মের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার কতগুলো সাধারণ নিয়ম একাধিক সমালোচকদের কাছ থেকে সমাদর লাভ করে আসছে। রীতিগুলো যে একেবারে অভাবনীয় এবং অপরিবর্তনীয় এমন বলা যায় না। তবে এর শৃঙ্খলাপূর্ণ অনুশীলন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত লেখক সম্পর্কে পাঠক সাধারণের খণ্ডিত ও অস্পষ্ট ধ্যানধারণাকে সহজে সংহতি ও স্বচ্ছতা দান করে।

প্রথম কর্তব্য পরিবেশকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা। শিল্পীর জীবন যে স্থান ও কালের অধীন ছিল তার ব্যাপক পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করা। কিন্তু সে পটভূমি ভাব ও কর্মের সহস্র ধারায় অভিষিক্ত, তার সকল আবর্ত হয়ত সরাসরি চিত্তবিশেষকে স্পর্শ করেনি। তাই প্রয়োজন হয় সেই পরিব্যাপ্ত বিরাট পশ্চাৎপটের বিশেষ এলাকা সীমাচিহ্নিত করা, যার সংক্রমণ-বিশেষ শিল্পীর মানস গঠনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তার নানা অনালোকিত প্রবণতাকে প্রখর করে তুলেছে। পরিবেশ থেকে প্রামাণ্য ও প্রাসংগিক তথ্য চয়ন করে, তার সংগে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক স্থাপন করে শিল্পীর সামগ্রিক মানস সংঘটনের একটা মূল্যবান স্থূল প্রতিকৃতি রচনা সম্ভব। এই বিচারেরই বিপরীত পিঠ বা পরবর্তী স্তর হলো শিল্পীর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁর বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলনকে লোচন করা এবং তার নানা সংকেতকে অনুসরণ করে শিল্পীর পরিপূর্ণ মানস-মণ্ডলের চিত্র রচনা করা। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা শিল্পবিচারের ঋজুতর মানদণ্ড

আরোপ করে লেখকের কোনো বিশিষ্ট রচনার বা রচনারীতির কোনো সুনির্দিষ্ট রূপের রসোৎকর্ষ ও কলাকৌশলকে পাঠকের ধারণাধীন করে তুলতে সচেষ্ট হই।

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য মূলতঃ দ্বিতীয় স্তরের। কখনো কখনো প্রসংগ রক্ষার অনিবার্য তাগিদে প্রথম ও তৃতীয় এলাকার প্রান্ত স্পর্শ করেছি মাত্র।

২.০. মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব বিচার পেশ করবার আগে অন্যান্য গবেষকবৃন্দ এই বিষয়ের ওপর নানা গ্রন্থে প্রবন্ধে যে সকল মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন তা সংক্ষেপে জরীপ করা যাক। নানা মুনির নানা মতের সীমানা নির্দেশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকেও স্পষ্টতা দান করতে সক্ষম হবো। মীর মশারফ হোসেন সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হোলো ঃ

ক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৮নং ২৯নং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা ১৩৫৫)।

খ। কাজী আবদুল ওদুদ, বিষাদ-সিন্ধু, শাশ্বত বংগ, (কলিকাতা ১৩৫৮), পৃঃ ১২৪-১২৬।

গ। আবদুল লতিফ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, (সিলেট ১৯৫২)।

ঘ। মুহম্মদ আবদুল হাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬), পৃঃ ৬৯-১১৪।

ঙ। আশরাফ সিদ্দিকী, মীর মশাররফ হোসেন, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা (ঢাকা ১৯৫৭), পৃঃ ১৭-২৫,। সম্পাদিত জমিদার দর্পণের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, (ঢাকা ১৩৬২)। মাসিক মোহাম্মদী, মাহে-নও ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।

চ। কাজী আব্দুল মান্নান, উদাসীন পথিকের মনের কথা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃঃ ৪২-৬৩।

ছ। মোহাম্মদ ইদরিস আলী, বাজীমাত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, (ঢাকা, ভাদ্র—চৈত্র ১৩৬৫)।

জ। আহমদ রফিক, শিল্প সংস্কৃতি জীবন, (ঢাকা ১৩৬৬)। দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ 'মীর মশাররফঃ অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার রূপায়ণ' পৃঃ ৯৮-১১২।

২.১. বলা বাহুল্য এই রচনাসমূহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। রচনাটি প্রাচীনতম হলেও পরবর্তী কোনো লেখকই মীর সাহেবের সমগ্র রচনাবলীর সংগে অধিকতর ব্যাপক বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যক্ত করতে সমর্থ হন নি। মীরের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে চুম্বক আকারে যত সংবাদ এখানে সরবরাহ করা হয়েছে এমন অন্য কোথাও নজরে পড়ে না। বিস্তৃততর তথ্য অনুসন্ধানের যে সব সংকেত এই পুস্তিকায় ছড়ানো রয়েছে তাকে সম্বল করেই আমরা মীর সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছি। গ্রামবার্তার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার যে মীর মশাররফ হোসেনকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন, সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে মীরের কোনো কোনো রচনার রদবদল করেছিলেন, বঙ্কিম যে বঙ্গদর্শনে মীরের দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন, ভারতীতে বিষাদ সিন্ধুর প্রশস্তি প্রকাশ, প্রদীপে গাজী মিঞার বস্তানীর ওপর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ, বসুধায় মীরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা মীর সাহিত্যের বিস্তৃত বিচার এবং এই পর্যায়ের আরো নানারকম অজানিত তথ্যের হদিস ব্রজেন বাবুই প্রথম দেন। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে মীরমানস ও মীরের সাহিত্যকীর্তির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ না হলেও, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি সংকলিত করে এবং প্রাসংগিক যাবতীয় তথ্যসম্পদের প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ দান করে তিনি সংক্ষেপে সাধ্যমত সম্পূর্ণ মশাররফ হোসেনকে চিত্রিত করেছেন। এই বিচারবিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সুনির্বাচিত সুশৃংখলিত তথ্যভাণ্ডারের সংগে আমাদের সাম্প্রতিক বর্ণনামূলক সংযোজনা এখন পর্যন্ত তুলনায় ক্ষীণ এবং গৌণ।

হয়ত স্বাভাবিক কারণে একটা বিষয়ে ব্রজেন বাবুর মীমাংসা সীমাবদ্ধ, একপেশে। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কিছু জীবন্ত কৌতূহল এই পুস্তিকা পাঠের দ্বারা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে না। এ লেখায় জোর পড়েছে

মীর সাহেবের সাহিত্যাদর্শের অসাম্প্রদায়িক বিশুদ্ধতার ওপর, মীর মানসের হিন্দুমুসলিম ভেদাভেদ লোপকারী প্রয়াসের ওপর, তাঁর ভাষার সংস্কৃতানুসারী সাধুতার ওপর। অবিশ্লেষিত থেকে গেছে মীর মানসে মুসলমানী ঐতিহ্যের চক্রমণ, মীর রচনাবলীর মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনার বহুরূপী প্রকাশ অথচ মীর রচনাবলীর এক বৃহৎ অংশ যে এই প্রশ্নের বিশদ বিচার দাবী করে সেকথা অস্বীকার করবে কে!

২.২. আশরাফ সিদ্দিকী ও আব্দুল লতিফ চৌধুরীর রচনা মূলতঃ বর্ণনামূলক, তথ্য পরিবেশনই তার প্রধান লক্ষ্য। দুজনের মধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর রচনা সংখ্যার বাহুল্যে এবং অনুসন্ধান কর্মে অক্লান্ত শ্রমশীলতার জন্য পাঠক সাধারণের কাছে অনেক বেশী প্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ। তবু যেসব কারণে তাঁর আলোচনা কৌতূহলী বিশেষজ্ঞের কাছে যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা আস্থা উদ্রেককারী নয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত আশরাফ সিদ্দিকী পরিবেশিত পুঞ্জীভূত তথ্যের আন্তর-পরিচর্যা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সামগ্রিক উপলব্ধির পরিচয় বহন করে না। এই কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সরলতা, বিচ্ছিন্নতা ও আকস্মিকতা মীরের দুনিয়া বা ধান্দা সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রকৃত নেত্রমুক্তি ঘটায় না। সম্প্রতি প্রকাশিত (মাহে নও, ডিসেম্বর ১৯৬০, ঢাকা) হিতকরী প্রবন্ধে কবে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, কোন্ কালে কে তার সম্পাদক সহসম্পাদক এজেন্ট ছিলেন, কোন্ ছাপাখানা থেকে ছাপা হোতো, সে ছাপাখানার মালিক কে ছিলেন ইত্যাদি অনেক লঘুগুরু সংবাদের জটিল তালিকা দিয়েছেন। কেবল যখন হিতকরী প্রথম পর্যায়ে মীর মশারফ হোসেন দ্বারা সম্পাদিত হোতো তখন এই পত্রিকায় কারা লিখতেন, কি নিয়ে লিখতেন, কোন্ ঢংগে লিখতেন সেই অতিবিহিত সংবাদটাই প্রচার করলেন না। ১৮৯৯ইং বা ১৩০৬ বাংলা সনে হিতকরী নব পর্যায়ে খাঁটি ও নিখুঁত মুসলমানি ভাবে প্রচারিত হওয়ায় মীর মানসের কোনো উল্লেখযোগ্য স্তরোত্তরণ সূচিত হোলো কিনা, মীরের সমগ্র সাহিত্য-কর্মের বিবর্তনধারার সংগে তার কোনো সংগতি আছে কি না সে সব কথা অমীমাংসিত থেকে গেল। জমিদার দর্পণের আলোচনা প্রসংগে আশরাফ সিদ্দিকী কাঙাল হরিনাথ সম্বন্ধে যে পর্যাপ্ত তথ্যের অবতারণা করেছেন তার

প্রাসংগিকতা গোটা প্রবন্ধের আয়তনের অনুপাতে গৌণ, মূল সিদ্ধান্তের পোষকতার বিচারেও মামুলী। স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল যে কাঙাল হরিনাথের জীবন চেতনা বরাবর এক তালে চলে নি; লালন ফকির এসে তার মূলে মোচড় দিয়ে গেছে! মীর সাহেব উভয় স্তরেই কাঙালের সুহৃদ ছিলেন। প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে এই ভাবদ্বৈতের কোনো স্পষ্ট স্বীকার নেই, ব্যাখ্যা নেই। এমন কি কাঙালের সংগে লালনের সাক্ষাৎকারের সময় নির্দেশের যায়গায় এসে লেখক অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। শুধু বললেন, কাঙাল যখন কুমারখালীতে তখন। তথ্য জড় করেও সত্য প্রতিষ্ঠার বেলায় মীরের চিত্তদর্পণের একাংশকেই মাত্র মূল্য দান করলেন। তাও এমন এক অংশের যার ধারণা লাভ করা খুব শ্রমসাপেক্ষ ছিল না।

আশরাফ সিদ্দিকীর সাহিত্য বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো সর্বাপেক্ষা সরল ও দুর্বল। নাটক হিসেবে জমিদার দর্পণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে, মীরের সমাজ চেতনার নির্বিরোধ বাঙালিয়ানার পরিচয় দিতে গিয়ে, মীরের ভাষার খাঁটিত্ব বোঝাতে গিয়ে গর্জমান ইংরেজী বাংলা উদ্ধৃতির যে আড়ম্বর প্রকাশ করেছেন তা বর্জনেই সত্য বেশী পোক্ত হোতো। মীরের পূর্বসূরীদের নামের তালিকা দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কালক্রম লংঘন করে, মুখ্যগৌণের ভেদ অস্বীকার করে তাঁদের সবাইকে দায়ী করেছেন সংস্কৃত রীতির নকলকার বলে। শেষে অনাবশ্যক সাফাই হিসেবে মীরের গতানুগতিকতাকে তুলনা করেছেন 'জলে যেন ভাসে মীন' এই প্রবাদ বাক্যের সুলভ সত্যতার সংগে।

গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদঘাটিত তথ্যের বিদ্যমানতা সম্পর্কে পাঠকের পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। একবার সেটা নষ্ট হলে সবই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা পাঠ করে সকল সময় ঠাহর করা যায় না যে কোন্ তথ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সত্যি প্রত্যক্ষ, কোন্ ক্ষেত্রে সেটা পরোক্ষ, আর কখন একেবারেই কল্পিত। বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেন প্রবন্ধে তিনি মীরবংশের যে পীঠিকা তৈরী করেছেন তা প্রমাদপূর্ণ। মীর সাহেব আরবী ফারসী নানা ভাষা এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, একথার কোন প্রমাণ নেই। মশাররফ হোসেন কোনো কালেই মেম বিয়ে করেন নি। কি হয়েছিল তার অকপট বর্ণনা আছে বিবি কুলসমে, আমার জীবনীতে নয়। মেম সংক্রান্ত ব্যাপারটা

ঘটেছিল কুলসুমকে বিয়ে করার অনেক পরে, আগে নয়। আশরাফ সিদ্দিকীর তথ্যবহুল প্রবন্ধে সত্যাসত্যের এমন এলোমেলো মিশাল সতর্ক পাঠকের শ্রদ্ধাবোধকে বিচলিত করে।

আবদুল লতিফ চৌধুরীর বইয়ের ভিত্তি ব্রজেন বাবুর পুস্তিকা। তবে যে সকল বই লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন সেগুলো সম্পর্কে স্বভাবতই বিস্তৃততর পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। গাজী মিঞার বস্তানী, বিবি কুলসুম ও ইসলামের জয়ের ওপর লেখা অংশগুলো পড়ে অনেক পাঠক উপকৃত বোধ করবেন। কিন্তু যে সকল বই লতিফ সাহেব দেখন নি অথচ তার ওপর মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেছেন সেসব ক্ষেত্রে মতামত হয় নিতান্ত মামুলী ধরনের, নয় রীতিমত বিভ্রান্তকারী হয়েছে। যেমন সুকুমার সেনের ওপর বরাত দিয়ে রত্নবতীকে বলেছেন রোমান্টিক উপন্যাস। আশরাফ সিদ্দিকীও রত্নবতীকে রোমান্সমূলক উপন্যাস বিবেচনা করে বংকিমের দুর্গেশনন্দিনীর সংগে তার তুলনা করেছেন। রত্নবতী প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা। তার ধর্ম উপন্যাসের চেয়ে রূপকথার অনেক কাছাকাছি। লতিফ চৌধুরী ও আশরাফ সিদ্দিকী কেউ গ্রন্থটি দেখেন নি বলে স্বাধীন ও পৃথক মত প্রকাশ করার কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। লতিফ চৌধুরী গ্রন্থের সার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমার জীবনী 'মীর সাহেবের বাল্যকাল থেকে দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বের কৌতুকাবহ জীবন-আলেখ্য' আসলে বইটি শোকাবহ।

অবশ্য লতিফ চৌধুরীর মূল্যবোধ যে সর্বত্র অগ্রাহ্য এমন কথা আমরা কখনো বলি না। গাজী মিঞার বাস্তনীপ্রসংগে নীচের মীমাংসা পরিণত রসদৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধের পরিচায়ক ঃ

> সাহিত্যিক মূল্য ও রচনাকৌশলের দিক দিয়ে কমলাকান্তের দপ্তরের সংগে গাজী মিয়াঁর বস্তানীর তুলনা হয় না। কমলাকান্তের দপ্তর দীপ্তবুদ্ধি, অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা ও অকাট্য যুক্তি বিচারের ফল। গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে প্রখর বুদ্ধি ও রসদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে গাজী মিয়াঁ যে কমলাকান্ত অপেক্ষা ভূয়োদর্শী একথা স্বীকার করতে হবে। গাজী মিয়ার বস্তানীর ভাষা কমলাকান্তের দপ্তরের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঃ বস্তানীর ভাষার সাথে আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বেশ মিল আছে। | পৃঃ ২১ |

বাজীমাত্ প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ ইদরিস আলীও মীরমানসের বিচারে সুস্থির রসবোধ এবং অস্থির ইতিহাস চেতনা উভয়কে অবহেলা করেছেন। যদি না করতেন তাহলে কখনই বলতে পারতেন না যে "বাজীমাত্ ব্যংগ-রংগ রচনা। তৎকালে প্রচলিত ব্যংগরচনার মতই এর মধ্যে স্থূলতার প্রশ্রয় আছে। এদিক দিয়ে সূক্ষ্মতা এখনও অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়নি। ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই ব্যংগের স্থূল রূপটা দেখিয়ে গেছেন।" বাজীমতের প্রকাশ কাল ১৩১৫। 'তৎকালে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবন অতিক্রম করে গেছেন। এই তৎকালে প্রচলিত ব্যংগরচনায় স্থূলতা যদি কোথাও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে তবে তা সাহিত্যের আসরে নয়, বটতলায়। বটতলায় আর একাল সেকাল কি; তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে রংগরস সৃষ্টির বিবর্তন ধারায় ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও দান একই বিন্দুতে স্থিতিশীল নয়। কালের বিচারেও সংবাদ প্রভাকর ও বঙ্গদর্শনের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশ বছরের পার্থক্য, তাৎপর্যের বিচারে, অনেক সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েক শত বৎসরের তুল্যমূল্য। দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়েই ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন নামে মাত্র, আসলে আয়ত্ত করেছিলেন গুরুমারা বিদ্যে। ঈশ্বরগুপ্তের পর দীনবন্ধু দামী ও দীপ্যমান ব্যংগরংগ সৃজনের ক্ষেত্রে আনকোরা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাংগালীর রসচেতনার স্তর ও পরিধি শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পরে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মই অশ্লীলতা ও কুরুচি, স্থূলতা ও গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ। ঈশ্বরগুপ্ত কি দীনবন্ধুর গুণকীর্তন করতে বসেও বঙ্কিম বদ্‌জোবান সম্পর্কে নিজের অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রাখেন নি।

কাজী আবদুল মান্নান লিখিত প্রবন্ধটির বর্ণনামূলক অংশ মূল্যবান। তবে উদাসীন পথিককে মীর মানসের সর্বোত্তম প্রতিনিধি নির্বাচিত করা শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল না। নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের এমন কিছু অবর্ণনীয় রূপ এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে ওঠে নি। বাল্যস্মৃতি মন্থন করে এবং অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনে অতীত পারিপার্শ্বিকের যে চিত্র পুনর্গঠন করেছেন তার মধ্যে অনেক রচনাকুশলতার পরিচয় থাকলেও উদাসীন পথিকের আসল তাৎপর্য

অন্যত্র অনুসন্ধান যোগ্য। মীরমানসের এক অতি সংকটপূর্ণ ক্রান্তিকালে রচিত এই গ্রন্থে লেখক মনের কথা বলার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিজের মনের গোপন কথার সংগে গোটা পরিবারের ও বাইরের প্রকাশ্য ঘটনাবলীর যোগসূত্র নিপুন ভাবে গ্রথিত হয়নি বলে এই বইয়ের কাহিনী অংশ একটা সামগ্রিক সুসংবদ্ধতা লাভ করেনি। তা সত্ত্বেও এই মনের কথার স্বরূপ বিচারে উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থ-রচনাকালীন মীরমানসের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল। সে কাজটাই বেশী জরুরী ছিল। মান্নান সাহেব এই প্রয়োজনকে গৌণমূল্য দান করায় প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাবয়ব হতে চায় নি।

খণ্ডিত বিচারের একশেষ করেছেন আহমদ রফিক। জমিদার দর্পণ, উদাসীন পথিকের মনের কথা এবং গাজী মিয়াঁর বস্তানীকে আশ্রয় করে লেখক মশাররফ হোসেনের অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার অকুণ্ঠ তারিফ করেছেন। জমিদার দর্পণে না হলেও শেষের বই দুটোতে যে মীর মানসের গণচেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে সমালোচক তা নিজ উদারতায় লক্ষ্যপথে আনেন নি। আনলে আরো লক্ষ্য করতেন যে মীরের পরবর্তী সকল রচনাই সার্থক, স্বসম্প্রদায় এবং স্বপরিবারের প্রতি একক প্রীতির নিদর্শন।

২.৩. কাজী আবদুল ওদুদই প্রথম মীর মানসের দ্বন্দ্বমূলক মূল সূত্রটি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা বিষাদসিন্ধু বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি মীরমানসের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপরীতধর্মী সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা সকলই মীরের স্বভাবজ। বিগত কালের রসবোধ ও জীবন-চেতনার যে প্রকাশ পুঁথিসাহিত্যে লক্ষ্য করি মীরমানস তার সংক্রামকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। "অনেকের ধারণা মীর মশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু জংগনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধু ভাষায় রূপান্তর মাত্র।" আবার বিষাদসিন্ধুরই এমন অনেক দিক ও অংশ আছে যা প্রমাণ করে যে মাইকেল বংকিমের শিল্পানুভূতিরও তিনি উত্তরাধিকারী। "জগৎ ও জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে

তার পরিচয়ও যথেষ্ট।" কাজী আবদুল ওদুদের বিচারের এই সংকেত অনুসরণ করে আমরা মীরমানসের স্বরূপ ও তার রূপান্তরের ধারা দুইই সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হই।

মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পাকিস্তানে প্রকাশিত যাবতীয় রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের অংশটুকু তথ্যের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বিচার-বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহ্যমানতার গুণে হয়ত অপ্রতিম নয়, কিন্তু তাই বলে সেগুলোর মূল্য সামান্য নয়। লেখক মীর মানস সম্পর্কে একাধিক মীমাংসার অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটির লক্ষ্য আরেকটু স্পষ্টতার সংগে মীর রচিত মানসের বৃত্তি ও বৃত্ত, ধর্ম ও মূল্য যথাযথ রূপ নিরূপণ করা। যে তিনটি মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের সংশয় এখনো কাটে নি তার দুটো হলো মীর মানসের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা এবং সমন্বয়ধর্মিতা প্রসঙ্গে, তৃতীয়টি বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের তুলনায় মীরের আসন নির্বাচন বিষয়ক।

মীরের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা বা শিল্পী জীবনের নিঃসংগতা বলতে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এই বোঝাতে চেয়েছেন যে মীর মশাররফ হোসেন সমাজসচেতন খুবই ছিলেন কিন্তু কোনো রকম সভাসমিতি বা প্রতিষ্ঠান আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মেহমেডন লিটারারী সোসাইটি থেকে সুরু করে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, ওহাবী থেকে বংগভংগ কোনো. কিছুই যেন মীর মানসকে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে যেতে পারে নি। হাই সাহেবের মতে মীরের এই নিস্পৃহতা মূলতঃ শৈল্পিক, তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগের ফল। অবশ্য একটু পরে একথাও তিনি বলেছেন যে "...এমনও হতে পারে যে তিনি ইচ্ছে করেই এসব জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, এতে প্রবেশ করে এর অংশভাগী হতে চান নি।"

জমিদার দর্পণ থেকে গাজী মিয়াঁর বস্তানী পর্যন্ত পাঠ করে কখনই মনে হয় না যে এই জীবন পথিক দুনিয়াদারীর ব্যাপারে শিল্পী সাধকদের মতো উদাসীন। বরঞ্চ যিনি বলাৎকারী হায়ওয়ান আলীর মতো জমিদার চরিত্র সোৎসাহে আঁকতে পারেন, যমদ্বারের মানুষরূপী আস্ত ... পিশাচীদের অবিকল প্রতিকৃতি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ... তিনি আর যাই হোন নির্বিকার পুরুষ নন। মীরের এই শ্রেণীর ... পেছনে ব্যক্তিগত ভাবে

আক্রান্ত হৃদয়ের উত্তাপ ও আলোড়ন এত প্রবল যে শৈল্পিক নৈর্বক্তিকতা পদে পদে নিগৃহীত হয়েছে। অপর দিকে শেষ বয়সের রচনাবলীর সমাজবিমুখ ধর্মানুপ্রাণতাও কেবল মাত্র বয়স্ক সামাজিকের সাধারণ অবসাদ ও নিরাসক্তিকে প্রকাশ করে, কোনো শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ততাকে নয়।

শিল্পীর নৈর্বিক্তকতা ও নির্লিপ্ততা সামাজিকের ব্যক্তিগত নৈর্বক্তিকতা ও নির্লিপ্তিতার ঠিক বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। শিল্পী পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনকে নিজের চিত্তদর্পণের সহস্র রংগেবিভংগে প্রতিফলিত দেখেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মথিত হন না। মীর মানস নিজের পরিচিত দুনিয়ার নিকট ঘটনাবলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আচ্ছাদিত। এই কারণে যে ঘটনা তাঁকে সরজমিনে গ্রাম, গৃহ, পরিবার, পেশার সূত্রে সরাসরি আঘাত করে নি তিনি সে বস্তুকে স্বাভাবিক ভাবেই উপেক্ষা করে এসেছেন। এ অবহেলা ঘোরতর রকম মানসিক, শৈল্পিক নয়। মীর তাঁর বক্তব্যের সংগে মানুষ হিসেবে যে পরিমাণ যুক্ত, অনেক ক্ষেত্রে, শিল্পী হিসেবে সে পরিমাণে তা থেকে মুক্ত নয়। হাই সাহেব তাঁর মূল সিদ্ধান্তের উপান্তে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা মিথ্যা নাও হতে পারে। বিবি কুলসুম থেকে তাঁর একটি সংকেত উদ্ধৃত করছি ঃ

> স্বদেশী অন্দোলোনে কুলসুম বিবি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারিদিগের দুই তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের খবর সন্ধান করিয়া বলিতেন যে,— ইহাদের এরূপ ঝকমারি কেন? ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনেকুবের— অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশজাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগত শ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী। বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ— বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? দিদিমনীরা সভাসমিতি করিয়া হাতের বলয় এবং অন্য অন্য অলংকার পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া দেশ উদ্ধার করিতেছেন। তোমাকে কাব্য বিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছে। দশ হাজার বিষাদ সিন্ধু সম্পাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে। মনিবে তিনমাস, চাকরে তিনমাস ঘুরাইয়া দিব্বি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে আনিও না। ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না।... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশী [illegible]র সভায় যাইতে পারেন। দু' বেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট [illegible] দেশের হিত সাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি [illegible]সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।

সভা-সমিতি সম্পর্কে মীরের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের এই কারণ সাচ্চা হলে তাকেও শিল্পী-সুলভ বলা চলে না।

মীর মানসের সমন্বয়ধর্মিতা তাঁর রচনাবলীর প্রথম আর্দ্ধেক অংশে হয়ত সত্য। বাদবাকী রচনার বিচারে এই গুণনির্দেশ অপ্রয়োজ্য।

৩'১ লাহিনীপাড়া, দেলদুয়ার, পদমদী। কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের এই তিন পূর্ব-বংগীয় গ্রামাঞ্চলে মীর মশাররফ হোসেনের কৈশোরোত্তর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে। কৃষ্ণনগর কলিকাতার সংগে একবার সামান্য যোগাযোগ ঘটে বাল্যে ও কৈশোরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে জীবনেও সৎ-সংগের অভাব ছিল। নাগরিক জীবনের যে এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের কলিকাতা সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও বোধকে আত্মসাৎ করে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মুখর ছিল মীর মানসের সংগে তার সম্পর্ক পরোক্ষ এবং দূরাগত। সতের বৎসর বয়সে (১৮৬৪) উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা আসেন। ঠিক হয়েছিল আলীপুরের আমীন পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাসায় থেকে পড়াশুনো করবেন। কিন্তু;

> ... লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনি না।... চাঁদ মিয়ার মুখেও না। সে কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন। আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আঘ্রাণ মন মজান, প্রাণ মাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পূজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহর আত্মা ... । আমার জীবনী।

আঠার বছর বয়সে মীরের সংগে নাদির হোসেনের দ্বিতীয় কন্যা আজিজন নেসার বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সম্ভবতঃ এই অতি সংক্ষিপ্ত কলিকাতা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাল্যকালের পড়াশুনোর বৃত্তান্তও গ্রাম্য মলিনতা থেকে মুক্ত নয়। হাতে খড়ি হয় মুন্সী সাহেবের কাছে, কারণ মুরব্বিরা বিশ্বাস করতেন যে, 'মুন্সী সাহেবের হাতে খড়ি দিলে দারগাগিরি চাকরী না হইয়া যায় না।' পাঁচ বছর বয়সে কোরান শরীফের প্রথম পারার বেশ

কিছুটা পড়ে ফেলেছেন। তবে অক্ষর পরিচয় বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরান পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরানের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে? চোদ্দ বছর বয়সে কুমারখালী ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ। মীরের আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে ঃ

> ইংরাজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিড়িমিড়ি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লা রসুলের নাম মুখে আসিবে না। ... ইংরেজী পড়িলে, একরূপ ছোট খাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়। জবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকের জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।... | আমার জীবনী।

এই সময়ে বাংলা চিঠিপত্র এবং হেঁয়ালী লেখাই ছিল মীরের অন্যতম কাজ। স্কুলে ফারসীও একরকম পড়ান হোতো। 'অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি গদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্সীজিকে সংগে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিষ্য অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।' বালক মীর পুঁথির বড় ভক্ত ছিলেন। যদিও 'পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।' পনের বছর বয়সে 'যৌবন জোয়ারারম্ভে' 'অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে, এরূপ হইল যে পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে।' সম্ভবতঃ ১৮৬৩ তে পদমদী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়তেন। ষোল বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সতেরতে কলিকাতা আগমন এবং প্রথম বিবাহ। নিয়মিত পাঠাভ্যাসের অন্য কোনো সংবাদ এর পর থেকে আর পাই না।

৩.২ মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির যে চিত্র মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী মূলক রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তার বৈভবের মধ্যেও একটা মধ্যযুগীয় স্থৈর্য্য প্রবল। মীর মশাররফ হোসেনের পিতা সেকেলে অর্থে বাদ্য গীত ও নৃত্যভক্ত মাহফেলী লোক ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনকে তাঁর মাতামহী অনেক দুঃখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন? ... সতীনের যন্ত্রণায় আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারেখারে গিয়াছেন। আমরা ত কোনো ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জ্বলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা ...?

মীর মশার্‌রফ হোসেনের চরিত্রে প্রথম কলংকদোষ ঘটে ঘরের দাসী-বাঁদীর সংসর্গে। ষোড়শ বর্ষে চন্দনমৃগীর নবাব মীর মহাম্মদ আলীর বজরায় মনোমোহিনী দেহপশারিণীর আহ্লাদ নাচগান রগড় রহস্যের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার বিষময় ফল ভোগ করেন। বারণীঠাকুরাণীর সংগে আলাপ পরিচয় কখন কি পরিমাণে ঘটে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি না থাকায় তার কাল নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সপ্তদশ বর্ষে গ্রাম্য প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে যাকে ভালবাসতেন তার বদলে অন্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে নতুন প্রেমিকা দ্বাদশ বর্ষীয়া কিশোরী কুলসুমকে দ্বিতীয় পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। মীর পরিবারের পীর বিনদীয়ার হজরত কুলসুমকে মুরিদ বলে গ্রহণ করেন এবং নিকাহের অনুমতি দেন। এই ১৮৭৩ থেকে মীরের নবজীবন সূচিত হোলো।

কুলসুমকে নেকাহ্‌ করার পূর্বে আমি মানব সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ছিলাম না। — পাঁচ ইয়ার লইয়া পঞ্চ মকারের সেবা ...! বিবি কুলসুম আমার গৃহে আসিলেন, গৃহিনী হইলেন। তাঁহার প্রথম কার্যই হইল আমার মতিগতি ফিরান, আমাকে সৎপথে আনা। ভূত প্রেত ছাড়ান। ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে; ঔষধ ধরিতে আরম্ভ হইল! ঈশ্বরের কৃপায় ধর্মশাস্ত্রমত একত্র সম্মিলনে ক্রমেই ভালবাসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। | বিবি কুলসুম |

দ্বিতীয় বিবাহের অন্ততঃ প্রথম দশ বৎসর মীরের সংসার সপত্নীবাদের হিংসানলে দাউদাউ করে জ্বলেছে। আজিজন্‌নেসা 'সপত্নী হিংসাবাদে দিন দিন মনের গতি ও সদিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসন নীতি আরম্ভ করিলে, শাসনে গর্জনে কুলসুম সহিত শত্রুতাচরণে, তাহাকে জব্দ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশলজাল গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন।' এমন কি 'আজিজন বিবি মীরসাহেব

আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আঁটিয়াছেন। অতি সহজ উপায়, দুইটি উপায়—কৌশলে হস্তগত করিয়া হস্তপদ বাঁধিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ। অথবা গলা টিপিয়া মারিয়া রেলওয়ে লাইনের উপর রাখিয়া দিলেই যে দেখিলেই বুঝিবে এরূপ মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি হতে পারে।' (বিবি কুলসুম) অষ্টাদশ বর্ষে বাংলা ১২৮৬ সনে বিবি কুলসুম সন্তানবতী হন। পরবর্তী পনের বছরে বিবি কুলসুম একাদশ সন্তানের জননী হন। মীর মানসের সৃষ্টিশীল বিকাশও এই পর্বে সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সার্থক। এই পরিতৃপ্ত জীবনের প্রত্যয়বোধকে মীর সাহেব যেভাবে বিবি কুলসুম বইতে ব্যক্ত করেছেন তার একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি।

> ১২টার মধ্যে স্নান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাঁধা নিয়ম। একত্র আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। ... কাছারি হইতে আসিয়াই তাঁহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব। ৩০ মিনিটের বেশী নহে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়া দেওয়া কুলসুম বিবির কর্তব্য কার্য ছিল। ৭টা বাজিলেই উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পুস্তক পাঠ, না হয় গ্রামোফোন গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা করা। রাত্রে আটটা বাজিলে আহার—আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পরে আমার নিজ লিখার কার্য। যেই ১২টা বাজিয়া গেল—আমিও শয্যায়। কুলসুম বিবি যে দিন নূতন কোন লিখার কথা শুনিতেন, সে দিন আর শয়ন শয্যায় যাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া গেলে, বিছানায় শুইতেন না। শৌচাগার গমন, বস্ত্র পরিবর্তন—প্রভাতীয় উপাসনা জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের সংগে সংগে চা আণ্ডা আলু সিদ্ধ আমার জন্য প্রস্তুত। আমি আমার জীবনে সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুম জন্য বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি।

বিবি কুলসুমের মৃত্যু বাংলা ১৩১৬ সনে। সেই বৎসরে প্রকাশিত বিবি কুলসুম মীরের শেষ রচনা। তার দু বছর পর মীর মশাররফ হোসেনও দেহাবসান করেন।

এই সুফলপ্রসু সুনির্মল দাম্পত্য জীবন অনভিপ্রেত ঘটনার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে নি। পরিশোধিত মীর-চরিতের সকল প্রবৃত্তি নবজীবনের

অনুপ্রেরণাধীন ছিল না বলে সন্দেহ করি। নিজের জীবন বর্ণনা প্রসংগে বিবি কুলসুমের শেষ পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার কথা এই ভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> ... হঠাৎ দেখি বিবি কুলসুম মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া বাড়ীর একটি দাসীকে মারিতে একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে তাড়া দিয়াছেন। আমি কিছুই বলিতেছি না। কারণ কোন বিষয়ে বিবি কুলসুমের হঠাৎ রাগ দেখিলে আমি চুপ করিয়া থাকি। ... আমি বলিলাম আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহার সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই।

ঐ বইতেই বাংলা ১২৯২ সনের আরেকটি গল্প বলা আছে। তখন মীর সাহেবের কলিকাতার ঠিকানা ১১নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। প্রিয়তম বন্ধু মুন্সী সাহেব মীর সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে পান খেতে গলির মধ্যে ঢুকেছেন। কোনো একটি ঘরের দুয়ারে দুই অপেক্ষারতা ইংগবংগ দেহপশারিণীকে লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ রংগরসের অবতারণা করায় তারা বিশেষ রুষ্ট হয়ে কিছু কটু বাক্য ব্যবহার করে। 'তাহার পর ঘটনাক্রমে এরূপ হইল যে শ্যামবর্ণা—যাহার কালা আদমীর প্রতি বেশী ঘৃণা—বৎসরকাল মধ্যে তাহার গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল।'

৩.৩ মীর মশার্‌রফ হোসেন যখন সাহিত্য সেবা সুরু করেন তখন বঙ্কিমের এবং যখন শেষ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক মীরের বসন্তকুমারী নাটকের এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণ মীরের জমিদার দর্পণের তের বছর আগে লেখা। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল সবই বিষাদসিন্ধুর আটদশ বছর আগে প্রকাশিত। কমলাকান্তের সংগে গাজী মিয়াঁর পার্থক্য পঁচিশ বছরের। মীর মশার্‌রফ হোসেনের জীবিত কালেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নষ্টনীড়, উপন্যাস চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা, নাটক বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, কবিতা গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্কিমের সংগে কোনো কোনো সূত্রে মীরের জীবন চেতনা ও শিল্পকলার যোগাযোগ আবিষ্কার সম্ভব হলেও রবীন্দ্রমানসের সংগে তাঁর সম্ভাব্য আত্মীয়তা

স্থাপনের প্রয়াস অবিহিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগের নজরুল ইসলামের সংগে মীর-মানসের রেশতেদারী কল্পনা করা আরো অসংগত। মীরমানসের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার ঐতিহ্য ও উৎস উপলব্ধি করতে হলে কালক্রম লংঘন করে বঙ্কিমেরও অনেক পেছনে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এমন কি মাইকেল-দীনবন্ধু-টেকচাঁদ-বিদ্যাসাগরও নয়, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালই হলেন মীর মশাররফ হোসেনের নিকটতম পূর্বসূরী। ঈশ্বর গুপ্তের সংগে যোগসূত্রটি সরাসরি নয়, দূরসংস্থিত। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে লিখতেন কাঙাল হরিনাথ, কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রামবার্তায় লিখতেন মীর মশাররফ হোসেন। কাঙ্গালের লেখার সংশোধন করতেন ঈশ্বরগুপ্ত, মীরের রচনা কাঙাল। জ্যেষ্ঠ গুপ্তের মৃত্যুর পর সংবাদ প্রভাকরের ক্ষীয়মান প্রতিপত্তির কালে যখন কনিষ্ঠ গুপ্ত সম্পাদক তখন তার সহসম্পাদক ভুবনচন্দ্র মজুমদার মীরের পরিণত রচনার রদবদল করার স্বাধীনতা গ্রহণ করতেন। বিবি কুলসুম লেখাপড়া শিখেছেন মীরের তত্তাবধানে। বিবি কুলসুমের প্রিয় কবি ছিলেন রঙ্গলাল। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল উভয়েই ছিলেন একালের কবি। নয়া জামানার কলিকাতা কালচারের স্পর্শ লাভ করলেও তাঁরা সে বস্তুকে সৃজনকর্মে পুনর্জন্ম দান করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষণ করে নিতে পারেন নি। নবযুগের বহিপ্রার্ন্তীয় পরশ, ইংরেজীতে নিয়মানের অধিকার পেছনের টানকে পরাভূত করতে পারে নি। মীরের সংকট আরো গভীরতর। তাঁর মানস প্রস্তুতির পটভূমিতে স্থূল ভুগোল হিসেবেও কলিকাতা নগরীর অবস্থান অস্বচ্ছ এবং অপ্রত্যক্ষ; বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের এই প্রতিকূল পরিমণ্ডলের বাসিন্দা হয়েও মীর মশাররফ হোসেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

অপর দিকে অস্তমান উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা কালচারের উদ্দণ্ড হিন্দুমূর্তি যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে তারও দুটো রূপ ছিল। একটা একটু পণ্ডিতী ধরণের। অনেক অংশে নাগরিকতা মণ্ডিত ও যুক্তিমার্গীয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের পুনর্গঠনে এঁদের প্রয়াস মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। শিক্ষিত মুসলমানের চিন্তাজগৎকে প্রভাবান্বিত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য এঁরা আরবী ফারসী সংস্কৃত ইংরেজী ভাল

করে আয়ত্ত করেছিলেন। মৌলবী মেয়ারাজ উদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশ্‌হাদী, শেখ আবদুর রহিম এই গোত্রভুক্ত। দ্বিতীয় ধারাটি তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ, সরল এবং গ্রামীণ। লেখায় এঁরা পুঁথি সাহিত্যের আদর্শকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন, বলায় ওয়াজ বহেসীয় যুক্তিতর্কের তরীকাকে। জন জমিরুদ্দিন, মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্‌, নইমুদ্দিন এই পথের পথিক। বলা বাহুল্য যে কোনো চিন্তাধারার শ্রেণীকরণের মতো আমাদের এ ভাগাভাগিও কিছুটা কৃত্রিম, বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার্থে সত্যবস্তু থেকে নির্মিত। উভয় ধারার সংগেই মীরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মীর-মানসের ক্রম বিকাশের প্রথম অধ্যায় দীনবন্ধু-মাইকেল-বংকিমের সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী চেতনার গৌরববোধে সমুজ্জ্বল। শেখ আবদুর রহিমের হাফেজ (১৮৮৭) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা দিয়েছেন। স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি-প্রকাশে অকুণ্ঠ হয়েও এঁরা তখন আজকালকার উপদ্রবী অর্থে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাছাড়া এই পর্বে এখনও মীর সাহেবের প্রধান উৎসাহ সাহিত্য-সৃজনে, সাধ্যমত মুসলমানী উপাদানের শিল্পগত রূপায়ণে। তৃতীয় পর্বে, মীরের বৃহত্তম সংখ্যক রচনা শিল্পানুপ্রেরণাহীন। ধর্ম বিষয়ক বাহ্য ও গৌণ ধারণা-দিতে অকীর্ণ মীর মানস এই পর্বে কেবল উপ-পুথিসাহিত্য সৃষ্টি করেই তুষ্ট ছিল।

৩.৪ মীর মানসের নানা অংগ ও ভংগী ভাল করে বোঝবার জন্যে সমগ্র মীর রচনাবলীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

ক। তাঁর প্রথম বিয়ে ১৮৬৫ সালে, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালে। অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থ সমূহের নাম রত্নবতী, গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু, বসন্তকুমারী নাটক, জমীদার দর্পণ।

খ। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সাল অপেক্ষাকৃত সৃষ্টিহীন পর্ব। সপত্নীবাদের বিষময় চক্রান্তে পড়ে মীর পরিবারে শান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। এমনকি '১২৯০ সালে কুলসুম বিবি বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ভাত কাপড়ের কষ্ট। - - - আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল।' । বিবি কুলসুম। ১৮৭৯তে প্রথম সন্তান লাভ, ১৮৮১তে দ্বিতীয়, ১৮৮৩তে তৃতীয়। এই সময়ে

প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ ১৮৭৫, ২৫এ সেপ্টেম্বরের 'গ্রামবর্ত্তা-প্রকাশিকা'র একটি বিজ্ঞাপন, এর উপায় কি 'প্রহসন' সম্পর্কে।

গ। ১৮৮৪তে দেলদুয়ার আগমন। ১৮৯২তে নবম সন্তানের জন্মলাভ পর্যন্ত দেলদুয়ারে অবস্থান। দাম্পত্য জীবনের এই পরিতৃপ্ত সন্তানবহুল পর্বেই বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯২) ও উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) সৃষ্টি হয়। দেলদুয়ারে জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার হিসেবে নানান জাতের লোকের নানা রকম নগ্ন ও কুৎসিৎ মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং অবশেষে ১৮৯২তে দেলদুয়ারকে 'জমদ্বার' জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

ঘ। ১৮৯২ থেকে ১৯০২ এই দশ বৎসরের এক মাত্র রচনা গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯, ১ম খণ্ড)। এটি পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর।

ঙ। ১৯০৩ থেকে ১৯১০। রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম এই অন্তিম পর্বে মীর মানস, শিল্পবিচারে, অবসন্ন ও উদাসীন। মানব জীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায় নি, ধর্মজীবনের গভীরতর উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে নি। বেশীরভাগ রচনাই অলৌকিকতামণ্ডিত, কিংবদন্তিপূর্ণ, অসংস্কৃত পুঁথিসাহিত্যের ইসলামের পুনর্নির্মাণ। আংশিক ব্যতিক্রম ইসলামের জয়, আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার জীবনী ও আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী।।

৩.৫ মীরের মানস বিবর্তনে একটি প্রধান বিদারণ-রেখা দেলদুয়ার ত্যাগের সমকালে কল্পনা করা যেতে পারে। এর আগের রচনা সমূহে মশাররফ হোসেন গভীর ও সরল জীবন চেতনায় যতটা আস্থাবান পরে তেমন নন। এই পর্বের জমিদার দর্পণে কেবল যে বোষদীপ্ত উচ্চকণ্ঠ গণদরদ ঘোষিত হয়েছে তা নয়, আবুমোল্লা ও নুরুন্নেহারের করুণ অনাবিল ঘরকন্নার চিত্রাংকনে গাঢ়তর জীবন বোধের আভাস আছে। প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় জর্জরিত মানুষ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহামূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, বঙ্কিমের মত মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে তার রূপকার ছিলেন। প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ রেবতীতে (বসন্তকুমারী নাটক) তার উন্মেষ, রূপজ মোহে আত্মবিক্রিত

এজিদে (বিষাদ সিন্ধু) তার পূর্ণ পরিণতি। মানবী জায়েদার ট্র্যাজেডিও কম মর্মস্পর্শী নয়। মীরের ধর্মানুভূতিও এই পর্যায়ে উদার, শিল্পীজনোচিত। সামাজিক বিচারবুদ্ধিতে একে অসাম্প্রদায়িক এবং 'সমন্বয়ধর্মী'ও বলা যেতে পারে। গোজীবনে তিনি সরাসরি এই মনোভাব যুক্তিতর্ক যোগ করে পেশ করেছেন। সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রেমময় শিল্পীসত্তা বিষাদ সিন্ধুতে এই অভিযোগ উত্থাপন না করে পারে নি যে ঃ

> কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ ভগবান! সমাজের মুর্খতা দুর কর। কুসংস্কারতিমির সদ্জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রতিভার বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে মনের গতিরোধ তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির যে বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করে না। এই সামন্য আভাসেই যথেষ্ট, আর বেশী দুর যাইব না। বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মুর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য পদে সম্বোধন করা হইয়াছে, মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছি। আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন। কারণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে। । বিষাদ সিন্ধু, ৪র্থ পর্ব।

মীর মানসের সংকট সূচনা প্রকৃতপক্ষে উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০) থেকে। নীলকুঠির লালমুখো সাহেবের সংগে নিজের পিতার আঁতাত অত্যাচারিত নীলচাষীর প্রতি লেখকের সমবেদনাকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছে। গাড়োয়ান জকির কোনো রূপবতী সখের ময়নাকে রূপার লোভ দেখিয়ে নিজ ঘরে আনা ছাড়া কেনী সাহেবকে দিয়ে অন্য কোনো লোমহর্ষক পাপকর্ম করান নি। অন্ততঃ সামনাসামনি নয়। কেনী-পত্নী ত মীরের শ্রদ্ধা লাভ করেছে। সাগোলাম নিপীড়িত চাষীপ্রজার জন্য সংগ্রাম করেও গ্রন্থে বড় হতে পারে নি

কারণ মীরের এই ভগ্নিপতিটি পারিবারিক সম্পত্তি দখলের ব্যাপারে মীর-পিতার সংগে অসৎ ব্যবহার করেছিল। নিজের পিতামাতার জীবন আদর্শস্থিতরূপে উপস্থাপিত করতে গিয়েও মীর সাহেব বিভিন্ন আপাতবিরোধী দৃশ্যের অবতারণা করে ফেলেছেন। এককালের জমিদার দর্পণের নাট্যকার আজ এই বইয়ে দীনবন্ধুকে মনের সুখে গালিগালাজ করেছেন। এসব সত্ত্বেও উদাসীন পথিকের মনের কথায় দুঃখীজনের জন্য যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে, শোষিত হিন্দুমুসলিমের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ শিল্পীর যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসপুষ্ট করে তোলবার জন্যে জটিল মানবহৃদয়ের যে পশ্চাৎপট নির্মিত হয়েছে, সবেই প্রমাণ করে যে মীর মানস এখনও তার সৃষ্টিশীল শিল্পচেতনার মহত্তর প্রথম অধ্যায়ের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নি।

সংকট ঘনীভূত হয়েছে ১৮৯২ র পর গাজী মিয়ঁার বস্তানী (১৮৯৯) রচনার আশপাশের সৃষ্টিহীন দশ বৎসরে। বস্তানীর জগৎ নারকীয়, ভালমন্দের ভেদজ্ঞান সেখানে লুপ্ত। মানবীয় হৃদয়ের অপার রহস্য মুগ্ধদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ্য করার পরিবর্তে লেখক কেবল মানুষ পশুর ঘৃণিত সামাজিক আচরণকে চীৎকার করে জাহির করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেও মীরের সংস্থা বাষ্পীভূত:

> ডিপুটী সাহেব বসিলেন, গায় গায় ঘেঁসাঘেসী করিয়া আদরে আহ্লাদে যেন কত পীরিতি, কত প্রণয় ভাব দেখাইয়া. গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিলেন, বসাইলেন। কিন্তু মনে মনে তিন হাত ফাক্। বিদ্বেষের ভাবও খুব আছে। তবে বাহিরে নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। হিন্দু, মুসলমানের জীবনের শত্রু। তবে যে ভাব, ভালবাসা মুখের মায়া, 'আমি তোমারই' সে কেবল আপন লাভ আর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।
>
> । গাজি মিয়ঁার বস্তানী।

একাধিক তুলনীয় চরণ আছে বাজীমাতে (১৯০৮) যেমন:

> বিশ্বাস ঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
> যেই পাত খায় ফোঁড়ে এমনি পাতক।

অথবা,

> তারা যে হিন্দুর [illegible] সংসারেতে পোকা। ইত্যাদি।

মীর মানসের এই পরিবর্তনের অব্যবহিত কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্ণয় করা সম্ভব হলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনশীল ধারাও হয়ত এর জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী। পাশ্চাত্য শিক্ষা নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কার্যত জাতিবৈর ভাব থেকে মুক্তিদান করে নি। সাহেবের লেখা ইতিহাসে মুসলমান শাসক মাত্রেই কামুক ও পীড়ক রূপে অংকিত। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে পাদ্রীর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ও রসুলুল্লাহ্ সম্পর্কে গর্হিত কথা অনেক দিন থেকে চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শিক্ষা ও সাহিত্যের বিষাক্ত পরিণতি ফলতে শুরু করেছে। সেকালের মুক্ত-বুদ্ধির অগ্রনায়ক ব্রাহ্মধর্মের নেতারা পর্যন্ত ক্রমে অলক্ষ্যে হিন্দুয়ানীর প্রচারকে পরিণত হলেন। জাতীয় সভার কাজ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু মেলার তদারক করা। যুগপুরুষ রাজনারায়ণ বসু ঘোষণা করলেনঃ 'মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সংগে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু-সমাজই আমাদিগের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়—যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ একহৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব।'

১৮৮৭ তে রাজনারায়ণ বসু 'মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহা সমিতি স্থাপনের আশা নিয়ে' বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রকাশ করলেন। বিরাশি থেকে সাতাশির মধ্যে বঙ্কিম লিখলেন রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম ইত্যাদি। বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে মীরকেও স্পর্শ করেছিল এমন অনুমান করা অসংগত নয়।

সমাজের কল্যাণ সাধনে নিরুৎসাহ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচারে বিমুখতা, মানুষের মহত্ত্বে অনাস্থা, ইহলোকের সৌন্দর্যে অশ্রদ্ধা, সবই ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে মীর মানসে তিল তিল করে দানা বেঁধেছে। মীরের শিল্পানুভূতিও

ক্রমশঃ পলায়মান। শেষ আট দশ বছরে সংখ্যায় অনেক বই লিখেছেন বটে, কিন্তু পূর্বতন মীরের সত্যদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি দুই-ই এখানে অনুপস্থিত। বইয়ের নাম প্রমাণ করে যে এগুলোর বিষয়বস্তু সরাসরি ইসলামিক ও ধর্মবিষয়ক। যেমন, মৌলুদ শরীফ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, মোস্লেম বীরত্ব, খোতবা ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে 'ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য তাঁর শিল্পী মনকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছে তারই বহির্বিকাশ' এই বইগুলোর মধ্যে আমরা দেখি এমন বলা চলে না। সেই জন্যে নজরুলের সংগে মীরের তুলনাও অচল। মীরের এই জাতীয় রচনার যা প্রকাশিত হয়েছে তা হৃতপ্রতিভা বৃদ্ধ মীরের সামাজিক সত্তার আচার-আচ্ছন্ন, সংস্কার-বশ ধর্মকর্মের কথা, প্রকৃত বিশ্বাসে গৃহীত, পুঁথি পরিবেশিত ধর্মবিষয়ক বাসনা ধারণাদির উপকথা মাত্র। স্থূলতারও অকুলান নেই। মেরাজ বর্ণনায় কবি লিখেছেন যে বেহেস্তে ঃ

অপূর্ব যুবতী নারী
দাঁড়াইবে সারি সারি
মণিময় রত্ন আভরণে।
সাজিয়ে অপূর্ব সাজে,
বীণা বীণ হাতে বাজে,
আর বাজে ঘুঙ্গুর চরণে॥

দাসী তুল্য সেবিবারে
সকলেই ইচ্ছা করে
যাতে সুখ হইবে যাহার।
মনের আনন্দে সেই
সুখী হবে বিধি এই,
হুর সনে করি ব্যবহার॥

অথবা নরকে,

সুখেতে হারাম করি
হেসে হেসে গর্ভ ধরি,
প্রসবিল যে নারী সন্তান।

সে পাপের পরিণাম,
অগ্নি শিশু অবিরাম
প্রসবে প্রবেশে যথা স্থান ॥

এসব দেখে-শুনে রসুলুল্লাহ্ জেব্রাইল ভাইকে ডেকে বললেন যে তাঁর উম্মতরা কখনও এত এরকম আজাব সইতে পারবে না। পাগড়ী খুলে তিনি সেজদায় স্থির হলেন। তখন দৈববাণী হোলো ঃ

ওহে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ) তোমার আব্দার।
রক্ষা হবে তুমি আজ অতিথি আমার ॥

বিবি খোদেজার বিবাহ থেকেও অনুরূপ অগ্রহণীয় পাদবদ্ধ চরণাদি কাতারে কাতারে উদ্ধৃত করা সম্ভব।

একটা কথা এইখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। বিষাদ-সিন্ধুর সৃষ্টিকর্তা মশার্‌রফ হোসেন কি এই শ্রেণীর কাব্যের দৃষ্টিভংগী ও আবেদনের স্বরূপ সম্পর্কে সত্যি হতচেতন ছিলেন? হয়তো নয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রতিভার সাধারণ ক্ষয়, পরিবেশের হীনতায় শিল্পচেতনার বিকার, অবস্থা বিশেষে সহজ রোজগারের প্রতি মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা, সব স্বীকার করে নেবার পরও মীর-মানসের এই বিবর্তনের একটা শৈল্পিক আদর্শগত কারণ লোচন করা সম্ভব। জীবনের উপান্তে এসে মশার্‌রফ হোসেন বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের নৈকট্য কামনা করেছেন, পনের আনা নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর মুসলিম জনতার সংগে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্দেশ্য ঃ তাদের জ্ঞান ও রুচির উন্নতি বিধান। উপায় ঃ সে মানস যা ভোগ করে অভ্যস্ত সেই পুথিসাহিত্যের রূপ রস ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করে পুনঃপ্রচার করা। বিবি খোদেজার বিবাহের ভূমিকা মীরের এই সচেতন পরিকল্পনার একটি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। আমরা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি ঃ

বর্তমান সময়ে বঙ্গবাসী মুসলমান সমাজে তিন শ্রেণীর পাঠক বর্তমান। এক শ্রেণীর পাঠক মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক পাঠ করেন। মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক ... সংখ্যা করা কঠিন। লিখকগণ সকলেই মুসলমান। পূর্বে আমীর-

হামজা, বাহারদানেস, জৈগুন, সোনাভান, আবুশ্যামা, ইউসুফজেলেখা, লাইলীমজনু, গোলেবকাওলী, চাহারদরবেশ, জঙ্গনামা প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পুস্তক সকল বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমান সময়ে কত পুস্তক ... গণনা করা কঠিন। এক একখানি পুস্তকের নামের পরিচয়েই বিষয়ের ও লিখকের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—আলমশ্যামী, মাণিকপীর, কাজিহয়রাণ। কালীর বউ ঘর ভাঙ্গানী, শ্যমন-বিমান, সুরতজামাল, লালমন, বীর হনুমানের লড়াই ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের কাট্‌তিও অধিক। পাঠক সংখ্যাও অত্যধিক। ২য় শ্রেণীর পাঠকগণ মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী, পুঁথি পড়ার আবশ্যক হইলে, ধর্মগ্রন্থাদি যাহা মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গানুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহার প্রতিই অধিক টান। তবে নূতন নাম ... পুস্তক প্রকাশিত হইলে —। এই শ্রেণীর মহোদয়গণ এসলামি ভাষায় লিখিত—কি সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রিকা যাহাতে মাত্র খবর থাকে তাহা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন না। এই দুই শ্রেণীর পাঠকগণের বিশ্বাস যে পদ্যে লিখিত না হইলে—কেতাব কি প্রকারে হয়?

•

পদ্যপদ সংযোজিত না করিতে পারিলে সে আবার লিখক কিসের; একথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার মুসলমানি বাংলা পুস্তক বটতলার বাজার হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকও পদ্যপদ ভিন্ন নহে। সমুদায় পয়ার ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। অনেক পুস্তকে আবার রাগ রাগিণী তালের পরিচয়ে গানও আছে। এই প্রকার নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। কত হিন্দু মহাশয় ছাপাখানা করিয়া মুসলমানি বাংলা পুস্তক ছাপাইতেছেন। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাই অধিক। বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, দত্ত, শীল, বসাক মহাশয় মল্লিকা আকার, কেয়ামত নামা, গো কোরবানীর ফজিলাত, হাজরাত ইসমাইলের বিবরণ—বিক্রয় করিতেছেন। লজ্জাতন্‌নেসার লজ্জতে মজিতেছে। ইহাতেই স্পষ্টই প্রমাণ মুসলমান সমাজে পদ্যের বড়ই আদর। ...

এখন তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক সম্বন্ধে কথা—কথা কিছুই নাই। তবে শাখা আছে পত্র আছে—মূল কাণ্ড সংখ্যায় অতি অল্প। ইহাদের রুচি পরিমার্জিত, সাধুভাষার দিকেই অধিক টান। এই শ্রেণীর মধ্যেই ভাল লিখক বর্তমান। সহজেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত। যথা—রেয়াজদ্দীন, আবদুর রহিম, মোজাম্মাল হাক, আবদুল হামিদ, পণ্ডিত রেয়াজদ্দীন এবং নওসের আলী প্রভৃতি প্রিয় ভ্রাতাগণ। ইহারা আবর্জনা ছাড়াইয়া মুসলমান সমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ

যত্নবান। কিন্তু সমাজের চৌদ্দআনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন করুন। কিন্তু দুই চারজন লিখক চৌদ্দআনা দলের সহিত মিশিয়া মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয় না?

'বিবি খোদেজার বিবাহ'

এরূপ সরল ভাষায় পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্যই এই বিজ্ঞাপনাভাস। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকগণের চক্ষে পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু শাখাপত্র শ্রেণীর চক্ষে পড়িবার কথাও নহে। আশাও করি না। এক প্রকার সে আশা দুরাশা। কারণ মৌলুদ শরীফ জাতীয় বিবরণ জাতীয় ধর্ম্মকথা, বাজে গল্প নহে, আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্ম্মসংস্রবী, আদব তামিজ সংস্রবী, শব্দ সমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশক প্রতিশব্দ না থাকিলেও কিছু না কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লিখক প্রিয় ভ্রাতা, ডাল খিচুড়ির সংগে দৃষ্টান্ত দিয়াছন। ... সুতরাং নব্য দলে — আদরণীয় হইবে না—লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। তার মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

৩.৬ কালানুক্রমিক শ্রেণীকরণ অতিক্রম করে কেবল বিষয়বস্তু, আংগিক ও আবেদনের বৈশিষ্ট বিচার করেও মীর রচনাবলীকে নানা গুচ্ছে ভাগ করা যেতে পারে।

বসন্তকুমারী নাটকে মীরমানসের জীবনরস রহস্য ভেদের যে প্রয়াস উন্মোচিত হোলো তা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে ইসলামী ইতিহাস আশ্রিত রোমান্সমূলক উপাখ্যান বিষাদ সিন্ধুতে।

সামাজিক শ্রেণীসংঘাতের যে সমালোচনার সুত্রপাত জমিদার দর্পণ নাটকে, তার বর্ণনামূলক বিস্তার উদাসীন পথিকের মনের কথায়, তার বিকার গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে।

আত্মজীবনী মূলক রচনায় মীরের উৎসাহ প্রথম প্রকাশ পায় উদাসীন পথিকের মনের কথায়। এই বিশেষ সাহিত্যিক রূপের আস্বাদন মীর মানসের সংকটকালেও

তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে। এমনকি মীর প্রতিভা শেষ পর্যায়ে যখন এক রকম নিঃশেষিত তখনও কেবলমাত্র এই শ্রেণীর দুটি রচনায়, আমার জীবন ও বিবি কুলসুমে, মীরের সৃষ্টিধর্মী ক্রিড়াশীলতা অক্ষুণ্ণ। মশাররফ হোসেনের শৈশব কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় জীবনের যে চিত্তাকর্ষক আত্মবর্ণনা এগুলোর মধ্যে বিধৃত, সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও তার মূল্য অপরিসীম। সম্ভবতঃ বিষাদ সিন্ধুর পর মীর মানসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই শ্রেণীর রচনায়।

মৌলুদ শরীফ থেকে আরম্ভ করে খোত্‌বা পর্যন্ত মীরের রচনাবলী স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার্য।